স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির জনকের জন্মশত বার্ষিকী স্মরণিকা

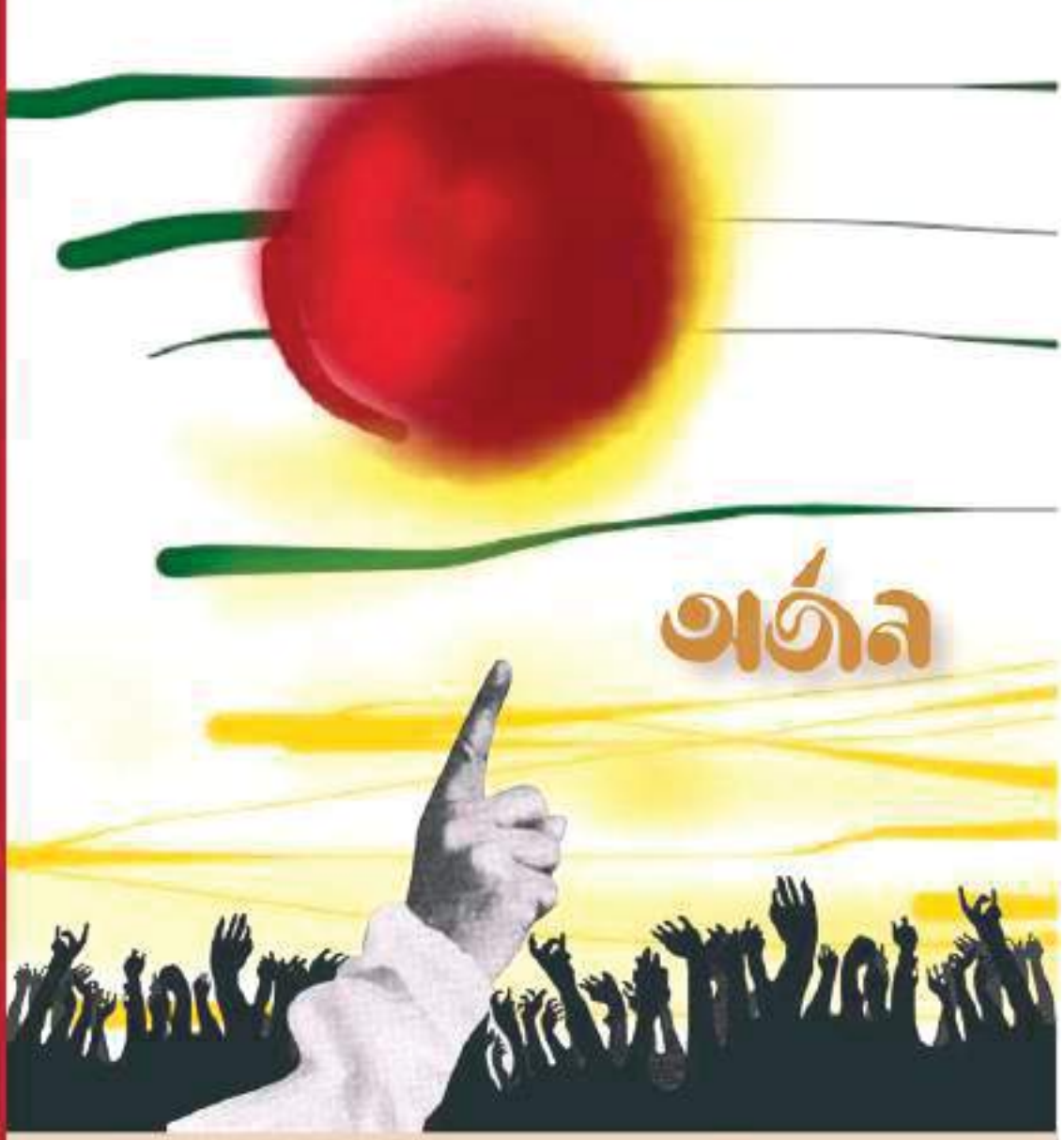

অর্জন

বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ
১১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

তাৎপর্যপূর্ণ। সংক্ষিপ্ত এক ভাষণে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মহান বন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন— আমি আপনাদের তিনটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমার প্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল বাংলাদেশের শরণার্থীদের আমি সসম্মানে ফেরত পাঠাব। আমার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে আমি সবরকম সহযোগিতা করব। আমার তৃতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল শেখ মুজিবকে আমি পাকিস্তানের কারাগার থেকে বের করে আনব। আমি আমার তিনটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি।... শেখ সাহেব তাঁর দেশের জনগণকে একটিই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন— তিনি তাদের স্বাধীনতা এনে দেবেন। তিনি তাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।

এর জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমাকে বলা হয়েছে ভারতের সঙ্গে আপনার কীসের এত মিল? আমি বলেছি ভারতের সঙ্গে আমার মিল হচ্ছে নীতির মিল। আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায়। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীও তাই বিশ্বাস করেন। আমাদের এই মিল হচ্ছে আদর্শের মিল, বিশ্বশান্তির জন্য...। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু একই দিনে দেশে ফিরে রমনার বিশাল জনসমুদ্রে আবারও বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।'

১৯৭২-এর ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বাংলাদেশের সংবিধানের রূপরেখা ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় পটভূমি হিসেবে ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদানের বিষয়টি প্রথম দিনই সংবিধানের খসড়া প্রণেতাদের তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণের শুরুতেই বলেছেন — 'জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে আমি আজ কয়েকটা বিষয় এখানে আলোচনা করতে চাই। আজ আমরা এখানে গণপরিষদের সদস্য হিসেবে বসবার সুযোগ পেয়েছি। আমরা আজকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পেরেছি এবং বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা যে আজ সার্বভৌম গণপরিষদের সদস্য হিসাবে কাজ করতে পারছি, সে সুযোগ এ দেশের জনসাধারণ তাদের রক্ত দিয়ে এনে দিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনেক দিন থেকে শুরু হয়। জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার জানা আছে যে, ত্রিশ লক্ষ ভাই-বোনের রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। এই গণপরিষদের সদস্য হিসাবে নিশ্চয়ই তাঁদের আত্মত্যাগের কথা আমরা স্মরণ করবো এবং মনে রাখবো। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, সে রক্ত যেন বৃথা না যায়। রক্ত দিয়েছে এদেশের লক্ষ লক্ষ ভাইবোন, নিরীহ জনসাধারণ। রক্ত দিয়েছে এদেশের কৃষক, ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীরা, রক্ত দিয়েছে ভূতপূর্ব ইপিআর, রক্ত দিয়েছে আনসাররা, মোজাহেদরা। রক্ত দিয়েছে প্রত্যেকটি বাঙালি, এমনকি সরকারী কর্মচারীরাও রক্ত দিয়েছে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। নিষ্ঠুর বর্বর ইয়াহিয়া খানের খানসেনারা যে অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে, তা থেকে বাংলাদেশের মা-বোনেরা পর্যন্ত নিস্তার পায়নি। লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে নির্যাতন করা হয়েছে। এই নরপশু সেনাদের আচরণের ইতিহাস দুনিয়ার আর কোথাও নাই।...

'জনাব স্পীকার সাহেব, আজ স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি চারটি স্তম্ভকে স্মরণ করতে চাই, যে স্তম্ভকে সামনে রেখে আমাদের দেশের সংবিধান তৈরি করতে হবে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আমরা গণতন্ত্র দিতে চাই এবং গণতন্ত্র দিতেই আজ আমরা এই পরিষদে বসেছি। কারণ, আজ আমরা যে সংবিধান দেবো, তাতে মানুষের অধিকারের কথা লেখা থাকবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। এমন সংবিধানই জনগণের জন্য পেশ করতে হবে। আজ এখানে বসে চারটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এমন সংবিধান রচনা করতে হবে, যাতে তারা দুনিয়ায় সভ্য দেশের মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।'

১৯৭২-এর ১১ এপ্রিল বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রস্তাবক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল গণপরিষদ, যাদের দায়িত্ব ছিল সংবিধান প্রণয়ন। তৎকালীন আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট এই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য মন্ত্রী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ছিলেন। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর ন্যাপ) থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তও খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন।

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় '৭২-এর ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবসের প্রথম বার্ষিকীর দিন। ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন করা হয় এবং বিস্তারিত আলোচনার পর ৪ নবেম্বর তা গৃহীত হয়। ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদের সদস্যবৃন্দ এই সংবিধানে স্বাক্ষর প্রদান করেন, যা কার্যকর হয় ১৯৭২-এর ডিসেম্বর থেকে।

'৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্রের চার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে। বাংলাদেশের মূল সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রের এই চার মূলনীতিকে আমরা বলি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, যা অর্জিত হয়েছে ৩০ লক্ষ শহীদের জীবনের বিনিময়ে। এই সংবিধানে ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কিন্তু ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্মপালন ও প্রচারের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। বাংলাদেশের মতো অনগ্রসর মুসলমানপ্রধান দেশের সংবিধানে

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শের এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৪ নবেম্বর (১৯৭২) গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হওয়ার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু এক অনন্যসাধারণ ভাষণ দিয়েছিলেন। আমার মতে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ১৯৭২-এর ৪ নবেম্বরের এই ভাষণ, যেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা প্রতিফলিত হয়েছে। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু 'গণতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নতুন ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা দিয়েছেন। গণতন্ত্র সম্পর্কে এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন— 'আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র– সেই গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। মানুষের একটা ধারণা আছে এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যে সব দেশে চলেছে, দেখা যায় সে সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের প্রটেকশন দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্রের ব্যবহার। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই, শোষিতের গণতন্ত্র এবং সেই শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো– আমার দেশের যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে তাতে সেসব বন্দোবস্ত করা হয়েছে যাতে এদেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়, শোষকরা যাতে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা নাই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সাথে অন্যের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক সিডিউলে রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন। অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারোর সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং নিশ্চয় আমরা কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, কাপড়ের কল, পাট কল, চিনির কারখানা সবকিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি। তার মানে হলো, শোষক গোষ্ঠী যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সেজন্য এখানে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।'

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর ৪ নবেম্বরের ভাষণে বলেছেন — 'আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি; এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা ঐগুলি জাতীয়করণ করেছি। যারা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হলো না, সমাজতন্ত্র হলো না, তাদের আগে বুঝা উচিত, সমাজতন্ত্র কি? সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনও তারা সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্র গাছের ফল নয়– অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিনের প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুর। সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছা যায়। এবং সেজন্য পহেলা স্টেপ- যাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি: – শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। এক এক দেশ এক এক পন্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কি আবহাওয়া, কি ধরনের অবস্থা, কি ধরনের মনোভাব, কি ধরনের আর্থিক অবস্থা, সবকিছু বিবেচনা করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে, এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে। রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করেনি, সে অন্য দিকে চলেছে। রাশিয়ার পাশে বাস করেও যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া নিজ দেশের পরিবেশ নিয়ে, নিজ জাতির পটভূমি নিয়ে সমাজতন্ত্রের অন্য পথে চলেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যান, দেখা যাবে, ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার মিশর অন্যদিকে চলেছে। বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে কোনদিন সমাজতন্ত্র হয় না; তা যারা করেছেন, তাঁরা কোনদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই। কারণ লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না– যেমন তা পড়ে আন্দোলন হয় না। সেজন্য দেশের পরিবেশ, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের রীতিনীতি, তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সবকিছু দেখে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা ৯ মাসে যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছি, তা আমার মনে হয় দুনিয়ার কোন দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম এনেছে তারাও সেগুলি করতে পারেন নাই,– এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোন কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা প্রসেসের মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।'

অনেকে বলেন ১৯৭২-এর সংবিধানে বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র যুক্ত করেছেন মস্কোপন্থী কমিউনিস্টদের প্রভাবে। কমিউনিস্ট না হয়েও যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণ করা যায় এটি বঙ্গবন্ধুর ৪ নবেম্বরের ভাষণে স্পষ্ট। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন— 'আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জনগণের কর্তব্য বিশ্বশান্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা। যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে যারা আবদ্ধ ছিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাদের সর্বস্ব লুট করেছে— তাদের প্রয়োজন নিজের দেশকে গড়া ও জনগণের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির দিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। বিশ্বশান্তির জন্য জনমত সৃষ্টি করা তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।""

বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে সমাজতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে তাঁর অবস্থান একাধিক স্থানে স্পষ্ট করেছেন— 'আওয়ামী লীগ ও তার কর্মীরা যে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করে। আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেক নেতা ও কর্মী আছে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে; এবং তারা

জানে সমাজতন্ত্রের পথই একমাত্র জনগণের মুক্তির পথ। ধনতন্ত্রবাদের মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করা চলে। যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তারা কোনোদিন কোনো রকমের সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের কাছে মুসলমান, হিন্দু, বাঙালি, অবাঙালি সকলেই সমান। শোষক শ্রেণিকে তারা পছন্দ করে না। পশ্চিম পাকিস্তানেও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এ রকম অপপ্রচার করা হয়েছে।'

বঙ্গবন্ধু গণপরিষদে প্রদত্ত ৪ নবেম্বরের ভাষণে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বলেছেন— 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবো না। ... মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারো নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খৃস্টানরা তাদের ধর্ম করবে তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার- এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিষ। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলবো ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলবো সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটি কয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।'

ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সব সময় সোচ্চার ছিলেন। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ কীভাবে বঙ্গবন্ধুদের যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চালিয়েছিল এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন— 'এই নির্বাচনে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে, জনগণকে 'ইসলাম ও মুসলমানের নামে' স্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায় না। ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানরা তাদের ধর্মকে ভালবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধি করতে তারা দিবে না এ ধারণা অনেকেরই হয়েছিল। জনসাধারণ চায় শোষণহীন সমাজ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি। মুসলিম লীগ নেতারা এসব বিষয়ে কোনো সুষ্ঠু প্রোগ্রাম জনগণের সামনে পেশ না করে বলে চলেছে 'পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে, মুসলিম লীগ পাকিস্তান কায়েম করেছে, তাই মুসলিম লীগ পাকিস্তানের মাতা, পাকিস্তান অর্থ মুসলিম লীগ ইত্যাদি। আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য নেতারা রাষ্ট্রদ্রোহী, হিন্দুদের দালাল, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা এক করতে চায়'— এ রকম নানা রকমের স্লোগান দিতে আরম্ভ করেছিল। জনগণ শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে জানত যে তিনি পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককে জানত, তিনি এদেশের মানুষকে ভালবাসতেন এবং মওলানা ভাসানীও পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছেন। আর আমরা যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেছি তাও জনগণের জানা ছিল, তাই ধোঁকায় কাজ হল না।'

স্বাধীন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাঁদের '৭২-এর সংবিধান রচনার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন তাঁদের সামনে ছিল যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, তুরস্ক, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সংবিধান। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধানসমূহ তাঁরা অধ্যয়ন করেছেন। তাঁরা পর্যালোচনা করেছেন এই সব সংবিধানের সবলতা ও দুর্বলতা। লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের জন্য শ্রেষ্ঠতম সংবিধানটি তাঁরা রচনা করবেন।

শুধু বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা নয়, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাসহ এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলসমূহের আলোকে আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে 'মৌলিক অধিকার' শীর্ষক অধ্যায়ে ২১টি অনুচ্ছেদ রয়েছে একাধিক উপচ্ছেদসহ।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থনদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রাম ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশ মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না এ বিষয়েও '৭২-এর সংবিধান প্রণেতারা সচেতন ছিলেন।

'৭২-এর ৪ নবেম্বর গণপরিষদে গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই সংবিধান যে সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় সংবিধানের ভেতর অনন্য স্থান অধিকার করে আছে এ কথা পশ্চিমের সংবিধান বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেছেন। বিশ্বের কোন দেশ কতটুকু সভ্য ও আধুনিক তা বিচার করবার অন্যতম মানদণ্ড হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি সেই দেশটির সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং তার প্রয়োগ। বিশ্বের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানের জনক হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল ১৭৭৬ সালে। মানবাধিকার শব্দটিরও জন্মদাতা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্রের একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ 'সেন্টার ফর ইনকয়্যারি'র পরিচালক ডঃ অস্টিন ডেসি 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র এক সেমিনারে (২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬) বলেছেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষাকবচ হিসেবে বাংলাদেশের '৭২-এর সংবিধানে ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠনের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও নেই। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে।'

শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষাকবচ হিসেবে ধর্মের নামে রাজনীতি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে অন্য কোন দেশ নিষিদ্ধ করতে পারেনি। এমনকি বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিবেশী ভারতের সংবিধানেও ধর্মভিত্তিক

রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে '৭৫-এ বঙ্গবন্ধু এবং চার জাতীয় নেতার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ মুছে ফেলার পাশাপাশি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে আলোকাভিসারী একটি জাতিকে মধ্যযুগীয় তামসিকতার কৃষ্ণগহ্বরে নিক্ষেপ করেছেন। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত '৭২-এর মহান সংবিধানের উপর এই নিষ্ঠুর কলাৎকার বাংলাদেশে পাকিস্তানি ধারার সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনীতির ক্ষেত্র তৈরি করেছে। আত্মগোপনকারী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জামায়াতীরা আবার মাথাচাড়া দেয়ার সুযোগ পেয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করলে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির এই তথাকথিত 'ইসলামিকরণ' বা 'পাকিস্তানিকরণ' সম্ভব হত না।

মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে জাতি হিসেবে বাঙালি কতটুকু সচেতন এবং কী পরিমাণ অসাম্প্রদায়িক তার চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখেছি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে। '৭১-এর মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু স্বাধীনতার ডাক দেন নি, 'মুক্তির সংগ্রামের'ও ডাক দিয়েছিলেন। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি এই মুক্তিসংগ্রামের ডাক ছিল সকল অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তি, সামাজিক অসাম্য, ধর্মীয় বিভাজন, জাতিগত নিপীড়ন, কূপমন্ডুকতা ও ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসনকাল ছিল ধর্মের নামে শোষণ-পীড়নের এক অন্ধকার যুগ। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সহযোগীরা স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন একটি প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য, যেখানে পাকিস্তানের মতো ধর্মের নামে বিভাজন, হত্যা, সন্ত্রাস, উন্মাদনা থাকবে না।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের শুধু সামরিক পরাজয়ই হয়নি, তাদের ধর্মের নামে রাজনীতি, হানাহানি, হত্যা ও ধ্বংসের দর্শনেরও পরাজয় ঘটেছিল। এটি সম্ভব হয়েছিল সকল ধর্মীয় বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে বাঙালিত্বের চেতনায় জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালিত্বের এই চেতনার প্রধান রূপকার, যার ভিত নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙালির এই ঐক্য পাকিস্তান ভেঙেছে, ধর্মের নামে রাজনীতির অমানবিক ধারণা ভেঙেছে। পরাজিত পাকিস্তান এবং তাদের এদেশীয় দোসররা বাঙালির এই ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য প্রথমে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সহযোগীদের হত্যা করে পাকিস্তানের সেবকদের ক্ষমতায় বসিয়েছে, '৭২-এর সংবিধান থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে ফেলে বাঙালিত্বের চেতনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ধর্মকে, যা তারা পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা থেকেই করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মের নামে রাজনীতি ও সন্ত্রাসের প্রতিষ্ঠাতা বিএনপির জনক জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য জাতিকে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, বাঙালি-বাংলাদেশী, ধর্মনিরপেক্ষতা-ইসলাম (রাজনৈতিক), সমরতন্ত্র-গণতন্ত্র প্রভৃতি দ্বন্দ্বে বিভক্ত করেছেন। 'আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দি পলিটিশিয়ানস'— এই ঘোষণা দিয়ে জেনারেল জিয়া বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতিষ্ঠান ভেঙে দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি 'মানি ইজ নো প্রবলেম' বলে রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক আদর্শকে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিনাশ ঘটানোর পাশাপাশি '৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির এই বিভাজন ঘটানো হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে অধিকাংশ সময় এ দেশটি শাসন করেছে পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি। '৭৫-এর পর বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির যে পাকিস্তানিকরণ/মৌলবাদীকরণ/ সাম্প্রদায়িকীকরণ আরম্ভ হয়েছে— বর্তমানে প্রায় এক দশক মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি ক্ষমতায় থাকার পরও আমরা '৭১-এর চেতনায় ফিরে যেতে পারিনি। '৭২-এর সংবিধানে জেনারেল জিয়া কর্তৃক বাতিলকৃত রাষ্ট্রের চার মূলনীতি পুনঃস্থাপিত হলেও এখনও সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক থেকে সংবিধানকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা যায়নি। সেখানেও বাধা হচ্ছে বিভাজনের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রাবল্য।

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার বিএনপি এবং তাদের প্রধান দোসর '৭১-এর ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতে ইসলামী ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রচলন করতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা ও ইসলামবিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করে সব সময় বলে ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ধার করেছে। ধর্মব্যবসায়ীদের এই মিথ্যাপ্রচারণা তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে, কারণ স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার চিহ্নিত শত্রুরাই অধিককাল ক্ষমতায় ছিল। ক্ষমতায় থাকাকালীন তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জঘণ্যভাবে বিকৃত করেছে। তারা সর্বক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। খালেদা-নিজামীরা এবং তাদের তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবীরা অহরহ বলেন, '৭২-এর সংবিধান রচিত হয়েছে ভারতের সংবিধানের মডেলে, ধর্মনিরপেক্ষতা নেয়া হয়েছে ভারতের সংবিধান থেকে। এই সব জ্ঞানপাপীরা জানেন না যে, ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র সংযুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হওয়ার চার বছর পর ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে।

ধর্মনিরপেক্ষকতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বহুবার বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়। প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালন ও প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। শুধু রাষ্ট্র ও রাজনীতি ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে, কোন বিশেষ ধর্মকে প্রশ্রয় দেবে না। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা এবং ধর্মের নামে হানাহানি এবং ধর্মব্যবসা বন্ধের জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন। এতে ধর্ম ও রাষ্ট্র দুই-ই নিরাপদ থাকবে।

সেই সময় অনেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের বক্তব্য ছিল

সেকুলারিজমের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— 'ইহজাগতিকতা'। ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা যথেষ্ট নয়। সব ধর্মের প্রতি সমান আচরণ প্রদর্শন করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে কোরাণ, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠ, ওআইসির সদস্যপদ গ্রহণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সেকুলার শিক্ষানীতি প্রণয়নে ব্যর্থতারও অনেক সমালোচনা তখন হয়েছে। পশ্চিমে সেকুলারিজম যে অর্থে ইহজাগতিক— বঙ্গবন্ধুর সংজ্ঞা অনুসারে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা সেরকম ছিল না। তাঁর সেকুলারিজম ছিল তুলনামূলক নমনীয়, কারণ তিনি মনে করেছেন ধর্মের প্রতি ইউরোপীয়দের মনোভাব এবং বাংলাদেশসহ অধিকাংশ এশীয় দেশের মনোভাব এক রকম নয়। বঙ্গবন্ধুর সেকুলারিজমের সংজ্ঞায় ধর্মের যথেষ্ট স্পেস ছিল।

ইউরোপে যারা নিজেদের সেকুলার বলে দাবি করে তারা ঈশ্বর-ভূত-পরলোক কিংবা কোন সংস্কারে বিশ্বাস করে না। বঙ্গবন্ধু কখনও সে ধরনের সেকুলারিজম প্রচার করতে চাননি বাংলাদেশে। ধর্মব্যবসায়ী রাজনৈতিকদলগুলোর কারণে বাংলাদেশের মানুষ ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ও অনীহ কিন্তু একই সঙ্গে এদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মপরায়ণ। শুধু ঈশ্বর ও পরকাল নয়, পীর ফকির ও পানিপড়াসহ বহু কুসংস্কারও মানে এদেশের অনেক মানুষ। বঙ্গবন্ধু সারা জীবন বাংলাদেশের দুখি মেহনতি মানুষের জন্য রাজনীতি করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের বিকাশ ঘটেছে গ্রামের সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে। বঙ্গবন্ধু জানতেন ধর্মবিশ্বাস ও সাম্প্রদায়িকতা এক নয়। এ কারণেই বঙ্গবন্ধুকে বলতে হয়েছে — ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের প্রতিটি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের বদৌলতে ধর্ম কীভাবে গণহত্যা ও ধর্ষণসহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞের সমার্থক হতে পারে। যে কারণে '৭২-এর সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি কারও মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। এভাবেই অনন্য হয়ে উঠেছিল '৭২-এর সংবিধান।

মুক্তিযুদ্ধকালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ বহুবার বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। মুজিবনগর থেকে যে সব পোস্টার বা ইশতেহার যুদ্ধের সময় বিলি করা হয়েছে সেখানেও অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি অবিস্মরণীয় পোস্টারের লেখা ছিল, 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খৃস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান — আমরা সবাই বাঙালী।' ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদ অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা, ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদানকে অস্বীকার করা এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশকে অস্বীকার করা।

জেনারেল জিয়া সংবিধানের ৫ম সংশোধনী জারি করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাতিল করেছেন, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছেন, সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ...' এবং প্রস্তাবনাসহ একাধিক স্থানে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সংযোজন করেছেন। এরপর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরেক উর্দিধারী জেনারেল এরশাদ সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষণা করেছেন। এসবের সঙ্গে প্রকৃত ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংবিধানের এসব সংশোধনী করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ যদি একটি ইসলামিক দেশ হবে তবে '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের কী প্রয়োজন ছিল— এর জবাব এই দুই জেনারেলের অনুসারীদের দিতে হবে। ৩০ লক্ষ মানুষের জীবনদান, কয়েক কোটি মানুষের অপরিসীম দুঃখ দুর্দশা ও আত্মত্যাগের কি কোন প্রয়োজন ছিল, বাংলাদেশে যদি ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদ না থাকে? পাকিস্তান তো একটি ইসলামিক রাষ্ট্রই ছিল। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীন করার প্রয়োজন হয়েছিল এদেশের মানুষ ইসলামের নামে শোষণ-পীড়ন-নির্যাতন-হত্যার রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে একটি অসাম্প্রদায়িক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিল বলে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সংবিধানকে গলা টিপে হত্যা করে সংবিধানঘাতক জিয়া-এরশাদ বাংলাদেশকে আজ জঙ্গী মৌলবাদীদের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছেন। এদেশে এখন কোরাণ ও সুন্নাহর আইন চালু করার জন্য হত্যা করা হচ্ছে অধ্যাপক, বিচারক, সাংবাদিক ও আইনজীবীসহ প্রগতিশীল রাজনৈতিকদলের নেতাকর্মী এবং সর্বস্তরের জনসাধারণকে। যে জামায়াতীদের হাতে লেগে আছে ৩০ লক্ষ বাঙালির রক্ত তারা এখন ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়ে নিজেদের গণতন্ত্রী, সন্ত্রাসবিরোধী ও শান্তিবাদী বলে দাবি করছে। বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী বার্মা, ভারত, পাকিস্তান, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা পর্যন্ত যাদের জেহাদী নেটওয়ার্কে বিস্তৃত তাদের উদারনৈতিক ইসলামিক দল হিসেবে সার্টিফিকেট দিচ্ছে খোদ আমেরিকা।

বর্তমানে বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা দেড়শ কোটিরও বেশি। ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সহ ৫৭টি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। মুসলমান প্রধান দেশসমূহে বঙ্গবন্ধু ছাড়াও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ও রাষ্ট্রগঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তুরস্কের মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক, আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানউল্লা ও ড. নজিবুল্লাহ, পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মিশরের প্রেমাল আবদুল নাসের, তিউনিসিয়ার হাবিব বরগুইবা, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, আলজেরিয়ার আহমেদ বেনবেল্লা, সিরিয়ার হাফিজ আল আসাদ, ইরাকের সাদ্দাম হোসেন ও প্যালেস্টাইনের ইয়াসের আরাফাত। এসব দেশের ভেতর সিরিয়া ও বাংলাদেশ ছাড়া মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশে ইসলামী বা রাজনৈতিক ইসলামের সমর্থক দলগুলো সরকার পরিচালনা করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে মোকাবেলার জন্য আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্ব লাল বলয়ের বাইরে সবুজ বলয় সৃষ্টির পরিকল্পনার অংশ

হিসেবে মুসলমানপ্রধান অঞ্চল ও দেশসমূহে হাসান আল বান্না ও আবুল আলা মওদুদীর রাজনৈতিক ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, যার ফলে বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিমপ্রধান দেশে ধর্মীয় মৌলবাদ উত্থানের পথ সুগম হয়েছে।

যে কারণে আমেরিকা ১৯৭১ সালে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তানের ইসলামপন্থী সামরিক জান্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল একই কারণে আমেরিকা এখনও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে বাংলাদেশকে 'মডারেট' ইসলামী দেশ হিসেবে দেখতে চায়, যে দেশ পরিচালনার জন্য তারা উপযুক্ত মনে করে জামায়াত-বিএনপি জোটকে, আওয়ামী লীগকে নয়। যেভাবে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকার জনগণ ও গণমাধ্যমকে আমাদের পাশে পেয়েছিলাম একইভাবে তাদের এখন আমাদের বলতে হবে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার না থাকলে এখানে জঙ্গী মৌলবাদের যে উত্থান ঘটবে তার হামলা ও আক্রমণ থেকে আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বও নিরাপদ থাকবে না। বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশে মৌলবাদী অসাংবিধানিক শক্তিসমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা থেকে আমেরিকাকে যদি বিরত রাখা না যায় মানবসভ্যতার যাবতীয় অর্জন ধ্বংস হয়ে যাবে।

বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতা আর কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতা এক নয়। ১৯২৮ সালে মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক ধর্মনিরপেক্ষতাকে তুরস্কের রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে গিয়ে সকল ধর্মীয় দল, প্রতিষ্ঠান এমনকি সুফীদের মাজারও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মসজিদের সংখ্যা সীমিত করে আরবির বদলে তুর্কি ভাষায় আজান চালু করেছিলেন। আমেরিকার হস্তক্ষেপ ছাড়াও এ নিয়ে তুরস্কের ভেতরও যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল, বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে। কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল ফ্রান্সের অনুরূপ, যেখানে সরকার ও রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল না। বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ছিল একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব, যেখানে রাষ্ট্র ধর্মের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করবে না, সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দেয়া হবে। মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে পশ্চিমা জগৎ কামাল আতাতুর্কের কট্টর মতবাদ সম্পর্কে যতটা জানে বঙ্গবন্ধুর উদার মতবাদ সম্পর্কে সে তুলনায় কিছুই জানে না। জামায়াত যেমন বলে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা, আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টে জামায়াতের সুহৃদরাও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাই মনে করেন।

'৭২-এর সংবিধান কার্যকর থাকলে বাংলাদেশে আজ ধর্মের নামে এত নির্যাতন, হানাহানি, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, রক্তপাত হতো না। বাংলাদেশের ৪৭ বছর এবং পাকিস্তানের ৭১ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যাবতীয় গণহত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসের জন্য দায়ী জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সমগোত্রীয় মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক দলগুলি, যা তারা করেছে ইসলামের দোহাই দিয়ে।

১৯৭২-এর সংবিধান হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের দর্পণ। বাংলাদেশ যদি একটি আধুনিক ও সভ্য রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়, যদি আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে চায়, যদি যুদ্ধ-জেহাদ বিধ্বস্ত বিশ্বে মানবকল্যাণ ও শান্তির আলোকবর্তিকা জ্বালাতে চায় তাহলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই।

Footnotes

১. বাংলাদেশ গণপরিষদ কার্যবিবরণী, ১৯৭২
২. বাংলাদেশ গণপরিষদ কার্যবিবরণী, ১৯৭২
৩. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ:-২৩৪
৪. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ:-২৫৮-২৫৯
৫. বাংলাদেশ গণপরিষদ কার্যবিবরণী, ১৯৭২
৬. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ:-২৫৮

(লেখক: বাংলাদেশের প্রোথিতযশা সাংবাদিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, মানবাধিকার কর্মী, ৭০টির বেশী পুস্তকের রচয়িতা। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত ১৯৯৫।)

"

Millions of fathers in rain
Millions of mothers in pain
Millions of brothers in woe
Millions of sisters nowhere to go

One Million aunts are dying for bread
One Million uncles lamenting the dead
Grandfather millions homeless and sad
Grandmother millions silently mad

Millions of daughters walk in the mud
Millions of children wash in the flood
A Million girls vomit & groan
Millions of families hopeless alone

"

(The September on Jessore Road By Allen Ginsberg)

জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধুর' সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি ভাবনা

ড. জিনবোধি ভিক্ষু

অপূর্ব সুন্দর এ পৃথিবী। বিচিত্র তার রং। এরই মাঝে কিছু মানব সন্তান। সেই মানবই হচ্ছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বা প্রাণী। পবিত্র কোরানে বর্ণিত হয়েছে– "আশরাফুল মাখলুকাত"। প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে উল্লেখিত আছে– এ মানুষই নররূপী নারায়ন। প্রখ্যাত পণ্ডিত চারণ কবি চন্ডীদাসের ভাষায়– "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। খ্রিষ্টান ধর্মে পবিত্র বাইবেলে আছে- "তোমাকে অবশ্যই তোমার ঈশ্বর সদা প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত আত্মা এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসতে হবে।' এটাই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ আদেশ। একটি সেকেন্ডও সমান গুরুত্বপূর্ণ: "আপনার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসুন।" এমন কি উনার সম্প্রীতির অমূল্য বাণী হচ্ছে- 'এক গালে থাপ্পর দিলে অপর গাল পেতে দাও।' এই যে মানুষের প্রতি মানুষের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীল উদার মানসিকতা সম্প্রীতির চেতনাকে সমুজ্জ্বল করে।

'মানুষ' শব্দটি আরো গভীরভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'মান+হুঁশ= মানুষ। 'মান বলতে আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মসম্মান এবং গুণগত মহিমা ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে । আর হুঁশ বলতে- সচেতনতা, জাগ্রত, বিবেক, বুদ্ধিমান, বোধ ও বোধি অর্জনের গুণাবলি ইত্যাদি অনুভূত হয়। এ দীপ্তিমান মানুষেরাই পারে এ সুন্দর পৃথিবীটাকে আরও অত্যাধিক সৌন্দর্য্য মন্ডিতরূপে গড়ে তুলতে। যা শুধুমাত্র মানুষের দৃষ্টিনন্দন করে তা নয় বরং শতধারায় মহিমান্বিত করে। এ চেতনা সমৃদ্ধ মানুষের দ্বারা সর্বধর্ম সমন্বয় যেমন দ্রুত হয় তেমনি মানবতা, মনুষ্যত্ব, মানবপ্রেম ও সম্প্রীতির ব্যাপ্তি সহজতর হয়। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা হানাহানী, বাদ-বিসংবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ নানা রকমের সংঘাত কমে যাবে। তখনই শোভনীয় ও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠে সমাজ, দেশ, জাতি ও বিশ্ববাসী । বিশ্বায়নের যুগ সন্ধিক্ষণে এটাই উন্নত মানুষের অন্তরের প্রত্যাশা।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এটাই মানুষের অভিনব সৃষ্টি। যা জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব। এখন প্রশ্ন: এ গুণ এবং আদর্শের মানুষ কি বিভাজিত নাকি এক। মানুষ তো মানুষই। তন্মধ্যে পুরুষ মানুষ আর নারী মানুষ বলে কোনো কথা নেই। বিশ্বের মধ্যে এক জাতি আছে- তার নাম মানুষ জাতি। জন্মের মাধ্যমে শারীরিক বা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তারতম্যের দরুণ এ বিভাজন লক্ষণীয়। আবার পুরুষ ও নারীর সম্বনয়ে অসংখ্য মানুষের সৃষ্টি হয় এই ধরাধামে। তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'মানুষ জাতি' কবিতার তিনটি পংক্তি এখানে প্রণীধানযোগ্য।

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে,
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত/ একই রবি
শশী মোদের সাথী"।

এই মহান উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায়, মানুষের গুণগত মানের মূল্যায়ন যেমন ফুঁটে উঠেছে তেমনি মানুষে মানুষে যে বিভেদ নেই এটাই প্রমাণ মেলে। অথচ আমরা বিবেকবান ও বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ হয়েও মানুষে মানুষে বিভাজন, বিবাদ, বিসংবাদ ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন করতে দ্বিধাবোধ করছি না।

বিখ্যাত পণ্ডিত কবির চৌধুরীর দৃষ্টিতে সাধারণত সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমরা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বুঝি। যদিও ধর্মের অঙ্গন ছাড়িয়ে ধর্মের অপব্যাখ্যাকে অবলম্বন করে তা যে শিল্প, সাহিত্যে, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও নীতির অঙ্গনকেও বিষাক্ত করে তোলে তা আপনাদের অজানা নয়। (মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ৩০ বছর, সম্পাদক: অরুণ দাশ (সাথী), চট্টগ্রাম-২, পৃ: ১৩৯)।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে আমিও মানুষ আপনিও মানুষ। এখানে সম্প্রদায় বলতে কোনো কথা নেই। আপনার-আমার মূল পরিচিতি হলো মানুষ হিসেবে। যার মাধমে মানবতা, মানবপ্রেম, মানবকল্যাণ, মানবসেবা ও মানবহিতৈষী মুক্ত চিন্তা-চেতনার মধ্যে মানুষের মূল্যায়ন ও মর্যাদা ফুঁটে উঠে। তাই এ মানুষকে ভালো মানুষ ও মানবিক দিক থেকে বলা হয়-'সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব।' এ মানুষের মানসিকতার মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির ভাব অতি আন্তরিক এবং গভীর হয়। এ চেতনা সমৃদ্ধ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিন্দুমাত্র লেশ থাকতে পারেনা বরং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় তার নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে দেখা যায়। মানবিক গুণের মানুষকে অবশ্যই বিবেকবান, সুখী চেতনা, মানবতাবাদী ও মনুষ্যত্বের ভাবাদর্শে সমৃদ্ধ হতে হবে।

বাংলাদেশ স্মরণাতীতকাল থেকে একটি সম্প্রীতি ও অসাম্প্রদায়িক দেশ। এখানে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, নৃ-তাত্ত্বিক আদিবাসী বলে কোনো কথা ছিল না সবাই। মানুষ অর্থাৎ সবাই বাঙালি। সুখে-দুঃখে একে অপরের সহায়কত ও অভিন্ন। তাই সাম্প্রদায়িক মনোভাব কোনোকালে মাথা চরা দিয়ে উঠতে দেখা যায় না। এখানেই সর্বধর্ম সমন্বয় যেমন অটুট ছিল সন্দেহ নেই। সাম্প্রদায়িক শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Communnal এবং সাম্প্রদায়িকতা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Communalism, Communnal বা Communalism শব্দটির আপাতত: দু' একটি নির্দেশ অর্থ থাকলেও বিশ্বের বেশ কিছু জায়গায় এবং ভারতীয় উপমহাদেশে কদর্য অর্থই সকল সভ্য মানুষের কাছে দিবালোকের মত পরিস্ফুট। সাম্প্রদায়িকতা বলতে-দাঙ্গা, হাঙ্গামা, সামাজিক ও রাষ্ট্রগতভাবে বিভেদ এবং সর্বোপরি

মানবতা অবমাননার এক লজ্জাজনক ইতিহাস রচিত হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে। সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা দু' শব্দের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সম্প্রদায়, জাতিগত বৈষম্য। মানুষ হয়েও পৃথক বা আলাদা মনোভাব তৈরী করা। সাম্প্রদায়িক বিষয়টি মারাত্মক ক্ষতিকর এবং বিভাজনমূলক। ছোট-বড় জাতি মানুষের কাছে এ সংকীর্ণ মানসিকতা মানুষ মানুষের দূরত্ব তৈরী করে। তাই অসম্প্রদায়িকতায় মানুষের মানবতা , মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, মমত্ববোধ, মানবপ্রেম, সৌভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন, সম্প্রীতি, সমন্বয়, বোঝাপড়া, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হলেই অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা গভীর থেকে গভীরতর হয়। বিশ্বায়নের যুগে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ও মানবিক নৈতিক চেতনার অবক্ষয়ের কারণে অসাম্প্রদায়িক চেতনা পদে পদে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। এটার পরিবর্তন ঘটাতে না পারি তাহলে মানবজন্মের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারছে না বিধায় সমগ্র পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প দিন দিন বেড়ে চলেছে। আর ধর্মের মৌলিক বিষয় হলো মানুষের ভালোবাসার ব্যাপ্তি ঘটানো। কোনো ধর্ম বিভেদ সৃষ্টি করে না বরং মানুষের সেবা ও কল্যাণ করাই ধর্মের নির্যাস, গভীরত্বের দিক থেকে আমার মধ্যে আমাকে জানাই হচ্ছে ধর্ম। এ নীতি, আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ সত্য, সুন্দর, ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য বলেই সুন্দর পৃথিবীর আরও সুন্দর হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তিনি তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই বঙ্গদেশ এবং বিশ্বের মানুষদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং অসাম্প্রাদায়িক মনোভাবকে জাগিয়ে তোলার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম ও প্রতিবাদমুখর হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অসাম্প্রদায়িক শুধু নয় সম্প্রীতির চেতনার প্রমানস্বরূপ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বাংলার লোকজীবনে, গ্রামীণ মেলা ও উৎসবাদিতে, কৈজসপত্রের নক্শা প্রভৃতিতে এর হাজারো দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতিভাব। এ প্রসঙ্গে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন পারিবারিক সম্প্রীতি, সামাজিক সম্প্রীতি, প্রতিবেশিদের সম্প্রীতি, সাংগঠনিক সম্প্রীতি, জাতিগত সম্প্রীতি, রাজনৈতিক সম্প্রীতি, কর্মজীবনে সম্প্রীতি, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উক্ত বিষয়ের বাস্তবায়নে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দৃষ্টান্ত রাখা সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ না করলেও বুঝার বিষয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেত্রীবৃন্দের মধ্যে এ জাতীয় মানসিকতা যতবেশি সমুন্নত হবে ততবেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিমণ্ডলে ধর্মসমন্বয় ও সম্প্রীতির ব্যাপ্তি ঘটবে আশা করা যায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন সকল ধর্মের মানুষ যেনো যার যার ধর্ম শান্তিতে পালন করতে পারে। ইসলাম হোক কিংবা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান যে কোনো ধর্মেই অশান্তি চাইনা। প্রতিটা ধর্মের মানুষ চাই তার ধর্ম যেনো শান্তিতে পালন করতে পারে।

সামগ্রিক উক্তি হলো ধর্ম যার যার উৎসব সবার। আমরা জানি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র-এ চারটি সংবিধানের মূল স্তম্ভ। এ সংবিধান জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রণীত হয়েছিল। এ সংবিধানের আলোকে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করে। এ ছাড়া এটি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে। যা কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণকে সমর্থন করে না। উপরন্তু সবশ্রেণীর মানুষকে স্বাধীনভাবে যার যার ধর্মপালনের অধিকার নিশ্চিত করে। ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু যে বাংলাদেশের সংবিধানে আছে তা কিন্তু না: কোনো কোনো রাজনৈতিক গঠনতন্ত্রেও আমরা সেটা দেখতে পাই। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যার পর প্রথমে ধর্মনিরপেক্ষতার মূলে কুঠার আঘাত করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা ধর্মীয় কারণে নয়, রাজনৈতিক কারণে। তখন সংবিধানের এই কাঁটাছেঁড়া শুরু হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা চলছে। অথচ ইসলাম ধর্মে সন্ত্রাসের ও জঙ্গীবাদের কোনো স্থান নেই। মূলতঃ ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম। সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। এক শ্রেণীর মানুষ ইসলাম ধর্মের নাম করে যারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে, রক্তপাত ঘটায়, ধ্বংসযজ্ঞ এবং নৈতিকতা বর্জিত অনৈইসলামিক কর্মকাণ্ড চালায়, তারা কখনো শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী হতে পারে না। তারাই ইসলামের আদর্শকে পদে পদে ভূলুণ্ঠিত করছে। তাদেরকে ইসলামের বড় শত্রু বলা হয়।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (স) তাঁর জীবনে পরম শত্রুর প্রতিও যে উদারতা, সহমর্মিতা দেখিয়েছেন তার নজির বিরল। পবিত্র কোরানে সুরা আল বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন- 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো বলপ্রয়োগ নেই। কারণ সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের রাজনীতির সাধনার মূলে অন্যতম আদর্শ ছিল অসাম্প্রদায়িকতা, মানবতাবাদ ও সম্প্রীতির। এ তিনটি আদর্শে পরিচালিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধও। ব্যক্তিমানুষ হিসেবে তিনি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলেও সব ধর্মের মানুষের প্রতি ছিল তার সমান ভালোবাসা। সেখানে বিশ্ব মানবতাবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার পাশাপাশি সম্প্রীতিভাব তাদেরকে তাড়িত করেছে।

বর্তমান বাংলাদেশেও অসাম্প্রদায়িক চেতনা তথা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি লালনের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ, এর মূলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, এর মূলে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। দেশের হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান-বৌদ্ধসহ সব সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। প্রায় ২৪ বছরে পাকিস্তান শাসক ও শোষকদল এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করেছেন। শেষ পর্যন্ত নিজের রক্ত দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন, একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক বাঙালি, মানবতাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ মানুষ

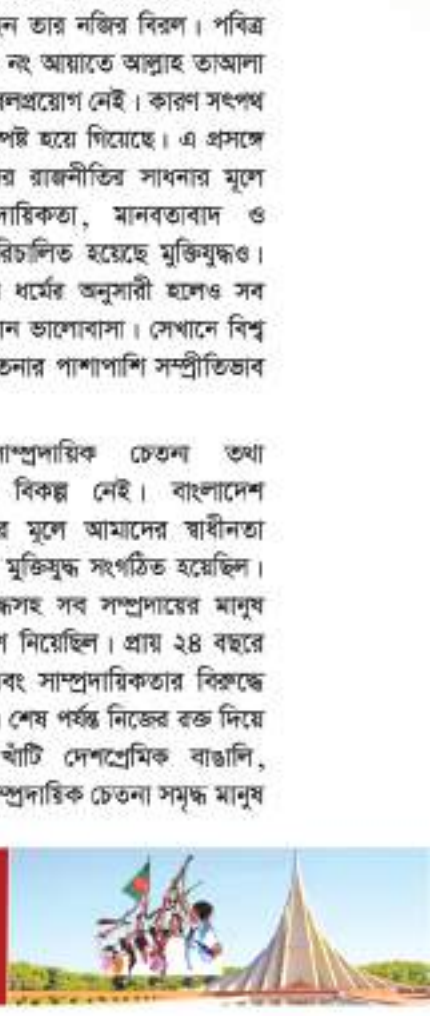

ছিলেন তিনি। এর ফলশ্রুতিতে পরাধীন বাঙালি জাতি দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দু'লক্ষাধিক মা-বোনদের সম্ভ্রম নষ্টের বিনিময়ে বিগত ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন লাল সবুজ জাতীয় পতাকা। নির্দিষ্ট একখানা ভূখণ্ড (১,৫৬,৫৭০ বর্গকিলোমিটার) এবং বাংলা ভাষা-রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। যা জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আজ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি মহোৎসব অতি গৌরবের এবং অতি অহংকারের বর্ষ বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাঙালি জাতি বীরের জাতি এটাই প্রমাণিত।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিজয় অর্জন করে। বাংলার জনগণ পায় শৃঙ্খলমুক্তি ও স্বাধীনতার স্বাদ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, 'আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র হবে, রাষ্ট্রের ভিত্তি কোনো ধর্মীয় কাঠামো দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে না। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা হবে রাষ্ট্রের ভিত্তি' (রামেন্দু মজুমদার, অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক বঙ্গবন্ধু, দৈনিক ইত্তেফাক, বৃহস্পতিবার, ৯ আগস্ট, ২০১৮)।

সকলের জ্ঞাতার্থে আরো উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩ সালে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছিলেন আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে। সারা বিশ্বের কাছে তখন তিনি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিসংগ্রামের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এসেছিলেন একই সম্মেলনে অংশ নেয়া কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো। এ সম্মেলনে বৈঠক হয় লিবীয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফি ও সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সঙ্গে। তারা বঙ্গবন্ধুকে শর্ত দেন, বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করলে তারা স্বীকৃতিসহ সব ধরনের সহযোগিতা দেবেন। গাদ্দাফি বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চান, বাংলাদেশ তাদের কাছে কী চায়? বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা চাই লিবিয়ার স্বীকৃতি। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি লিবিয়ার স্বীকৃতি।' বিশিষ্ট নেতা মুয়াম্মর গাদ্দাফি জানান, এর জন্য বাংলাদেশের নাম বদলিয়ে ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ করতে হবে। বিপ্লবী অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু পাল্টা জবাব দেন, 'এটা সম্ভব নয়। কারণ বাংলাদেশ সবার দেশ। মুসলমান, অমুসলমান সবারই দেশ।' এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাবাদর্শে উজ্জীবিত করা নচেৎ যে কোনো দেশ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় না থাকলে কখন নতুবা শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা ও অর্থনৈতিক উন্নতি কোনোভাবেই সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

বঙ্গবন্ধু কতটুকু অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-ভাবনাকে মনে প্রাণে ভালোবাসতেন বিগত ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন : 'রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে, যারা সাম্প্রদায়িক তারা হীন, নিচ, তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালোবাসে সে কোনো দিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আপনারা যারা এখানে মুসলমান আছেন তারা জানেন যে, খোদা যিনি আছেন তিনি রাব্বুল আলামিন। রাব্বুল মুসলিমিন নন। হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক সব মানুষ তার কাছে সমান। সেজন্যই একমুখে সোশ্যালিজম ও প্রগতির কথা এবং আরেক মুখে সাম্প্রদায়িকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। একটা হচ্ছে পশ্চিম। যারা এ বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা করতে চায়, তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে যাও। আওয়ামী লীগের কর্মীরা, তোমরা কোনো দিন সাম্প্রদায়িকতাকে পছন্দ করো নাই। তোমরা জীবনভর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ। তোমাদের জীবন থাকতে যেন বাংলার মাটিতে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন না করতে পারে।' রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সর্বজাতির মহামিলন ও উন্নয়নে কত উদারপন্থি ছিলেন উক্ত উক্তিটিতে মানুষের প্রতি যথেষ্ট মহানুভবতার পরিচয় মেলে।

গর্ব করে বলতে পারি, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গুণ ছিল অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী চেতনা শুধু নয় এবং মানুষকে আপন করে নেয়ার অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁর অসাম্প্রদায়িক ও সম্প্রীতির মানস গঠনে পিতার অবদান ছিল অনেক বেশি। বঙ্গবন্ধুর পিতা চেয়েছিলেন তার সুযোগ্য সন্তান যেন ন্যায় ও সত্যের পথে থেকে সব বাঙালির মুক্তির কাণ্ডারি হয়ে ওঠে। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু পিতার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'বাবা রাজনীতি কর আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছ এ তো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না। আর একটা কথা মনে রেখ, Sincerity of purpose and honesty of purpose থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না।' বঙ্গবন্ধু সে কথা কোনোদিন ভোলেননি (শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-২১)। পিতা প্রদত্ত মানুষ হওয়ার দৃঢ় নির্দেশকে বঙ্গবন্ধু তার রাজনৈতিক জীবনের আদর্শ মেনে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষ সবার প্রিয় মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

১৯৪৭- সালের ১৪ আগস্ট দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান নামক একটি আলাদা রাষ্ট্রের (পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান) সৃষ্টি হলেও পাকিস্তানের শাসকদল তাদের নয়া উপনিবেশবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে আরো উসকে দেয়। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা সাধনের লক্ষ্যে তারা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গণেও সাম্প্রদায়িক চিন্তাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। পণ্ডিত চণ্ডীদাস, জাতীয় কবি নজরুল ও নোবেল জয়ী রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী আদর্শ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মানষকে প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক

আন্দোলনের দিকে নিয়ে যায় । ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বিভিন্ন গণআন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭১- সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের মানুষের মধ্যে জাতিগত বিভেদ এবং কোথাও সাম্প্রদায়িকতার ছিটেফোঁটার আভাস ছিল না। যা প্রবলভাবে উপস্থিত ছিলো তা হলে এই উদার ধর্মনিরপেক্ষ জীবনধর্মী মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং হাজার বছরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতির দীপ্ত চেতনা এসবকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ, যার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। উপনিবেশবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ বাঙালি জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িকতার প্রসার রুদ্ধ করেছিলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ অসাম্প্রদায়িকতার প্রসারকে উৎসাহিত করলো। একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ আরেকজন মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতে চায়। ধর্মাচরণ তাঁর কাছে একান্তভাবেই ব্যক্তিগত বিষয়। আরেকজন মানুষ মন্দির, মসজিদ অথবা গির্জায় প্রার্থনা করতে যায় কিনা তা জানতে সে তেমন উৎসাহী নয়। তাঁর কাছে নিজের সম্প্রদায়ের একজন অসৎ মানুষ শুধু তার নিজের সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই অন্য সম্প্রদায়ের একজন সৎ মানুষের চাইতে বেশি প্রিয় হয় না। অসাম্প্রদায়িক মানুষ যান্ত্রিকভাবে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালনকে গুরুত্ব দেয় না, সে গুরুত্ব দেয় মানুষের হৃদয়কে, যে হৃদয় সম্পর্কে নজরুল বলেছেন- "এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট/ এই হৃদয়ই সেই নীলাচল, কাশী মথুরা, বৃন্দাবন/ বুদ্ধগয়া-য়, জেরুজালেম-এ, মদিনা, কাবাভবন, / মসজিদ এই মন্দির এই গির্জা এই হৃদয়।" অসাম্প্রদায়িক মানুষ ধর্মের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদী ভূমিকা নিতে পারে, উদ্দেশ্য করে নজরুলের মতোই বলতে পারেন: "শিহরি উঠো না: করো নাক বীর ভয়/ তাহারা খোদার খাদে প্রাইভেট সেক্রেটারী তো নয়। অসাম্প্রদায়িক মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন নানা দেশের নানা যুগের মানবতাবাদী কবি সাহিত্যিকরা। তাকে অনুপ্রাণিত করে টমাস পেইন (১৭৩৭ - ১৮০৯) তার এইজ অব রীজন' গ্রন্থে যা লিখেছেন তা হল : "আমি বিশ্বাস করি মানুষের সাম্য এবং বিশ্বাস করি যে ন্যায় বিচার মমতা, দয়াদাক্ষিণ্য এবং আমাদের সঙ্গী মানুষদের সুখী করার প্রয়াসের মধ্যেই ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ নিহিত আমার নিজের হৃদয়ই আমার চার্চ।" তখন উদীয়মান থেকে তরুণ টকবকে ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মানসে তাদের এই আদর্শ মানবিক মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁর কোমল অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তখন থেকে হিন্দু, মুসলিমদের মধ্যে যত রকমের সাম্প্রদায়িক সংকট দেখা দিয়েছিল সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রতিবাদী অগ্রনায়ক শুধু ছিলেন না এর আশু সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এখানেই জনপ্রিয়তা বেড়ে ওঠে তাঁর ।

১৯৪৮ সালের দিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কায়েম রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় সভা করে বেড়াতেন। এ সময় পরিবেশ এমন উত্তাল ছিল যে, যে কোনো সময় হামলা হতে পারত। সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকে বললেন- 'তোমার উপরও অত্যাচার আসছে। এরা পাগল হয়ে গেছে। শাসন যদি এইভাবে চলে বলা যায় না কি হবে! আমি বললাম, স্যার, চিন্তা করবেন না, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি খোদা আমাকে দিয়েছেন। আর সে শিক্ষা আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-১০৯)। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এদেশের জনগণ, বিশেষ কোনো গোষ্ঠী নয়। এদেশের জনগণের অধিকার আদায়, বৈষম্য সরিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা, মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার শিকড় উপড়িয়ে অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠন ছিল বঙ্গবন্ধুর লড়াই ও সংগ্রামী রাজনীতির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-আদিবাসীসহ সব মানুষকে তিনি নিজ ভাই জ্ঞানে দেখেছেন; কোনো ভেদাভেদ রাখেননি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতায় তাদের প্রচলিত ভাষায় কথা বলতেন এবং কোনো সভা-সেমিনারে ভাষণের শুরুতেই উপস্থিত সবাইকেই 'ভায়েরা আমার' বলে সম্বোধন করতেন (মোনায়েম সরকার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২২)। ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাতের ঊর্ধ্বে সব মানুষকে মনপ্রাণ উজাড় করে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসাই ছিল বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও মানবতার বড় দৃষ্টান্ত। 'ভাই' সম্বোধন দিয়ে বঙ্গবন্ধু বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে নয়, এদেশের ধনী ও গরিব, ব্রাত্যজন এবং দেশে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে বুঝিয়েছেন। এই মানসিকতা ও মূল্যবোধ বঙ্গবন্ধুর মগজে-মস্তিষ্কে ও শিরায়-শিরায় প্রবাহিত ছিল।

বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সাধারণ মানুষের মনের গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হওয়া আবশ্যক। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যে বাঙালি- বাংলাদেশীর কৃত্রিম কূটতর্কের জন্ম দিয়েছে তার নিরসন এর মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর নেতৃত্বের আসন লাভে কৃতার্থ ও ধন্য নেতা হিসেবে সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। নেতৃত্ব দিয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা কঠিন বিষয়। তিনি সেদিক থেকে অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা ছিলেন। হিন্দু-মুসলিম মিলিত বাঙালির উৎসবগুলিকে সচেতনভাবে ব্যাপক ভিত্তিতে উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পয়লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ। বসন্তবরণ, নবান্ন, পহেলা ফাল্গুন, পৌষ মেলা প্রভৃতি ঋতুভিত্তিক উৎসব সমূহকে আরো প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে সুমধুর মিলনমেলায় সুসংগঠিত করার সুযোগ রয়েছে। এইসব ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসব উদযাপনে রাষ্ট্র যদি পৃষ্ঠপোষকতা দান করে তাহলে রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক ভিত্তি মজবুত হবে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে সাম্প্রদায়িক চিন্তার বিকাশ ঘটানো হয়েছে। দেশজোড়ে প্রতিবাদের মুখে স্বৈরাচারী সরকার ওই অপকর্ম সাধন করেছিলেন সরলপ্রাণ সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতায় থাকার জন্য। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তখন দেশের সব বিরোধী দলই তীব্র প্রতিবাদ

জানিয়েছিল। আমাদের সংবিধানের যে সংশোধনীর মাধ্যমে ওই অপকর্মটি করা হয়েছিল তা বাতিলের জন্য ব্যাপক ও প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। যথার্থ গণতন্ত্রের চর্চা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের জন্যই বিশেষ করে সর্বধর্ম সমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তা প্রয়োজন।

জগতের সকল বস্তুরই ধর্ম আছে। অতএব, মানুষের একটা ধর্ম থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের এই ধর্মকে মানুষের মাঝে যে সমস্ত গুণ থাকলে মানুষকে মানুষ বলা যায় এবং যা না থাকলে আর মানুষ বলা যায় না, সে সমস্ত গুণাবলীই মানুষের ধর্ম। এ গুণগুলোকে এক কথায় বলা হয়- মনুষ্যত্ব বা মানবিক মহিমা। এই মনুষ্যত্বই মহিমায় মানুষকে মানুষ করেছে এবং এটাই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত ধর্ম। ধর্ম কোনো জাতি উপজাতির শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ধর্ম একটা মননশীল চিন্তা-চেতনার অনুভূতির ব্যাপার । আর এই অনুভূতি ও অনির্বচনীয়। তবে বিভিন্ন ভাষায় ধর্মের সমার্থক শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে জীবন চলার পথ (Way of life) ইংরেজিতে Religion শব্দটি সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ ধর্ম-এর অনেকটা সমার্থক। এর বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে, > একত্রীকরণ । Binding together a new (Re+legere)=Religion, Re= পুনরায় legere=একত্রীকরণ বা to bind together) ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক না কেন ধর্ম মূলত জীবন চলার পথ। কারণ Religion ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পন্ডিত Websters লিখেছেন- 'A specific fundamental set of belief/ and practices generally agreed upon by a number of persons or seets লোকগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সাধারণ ঐক্য বা মত্যে গৃহীত এক সেট নিদিষ্ট মৌলিক বিশ্বাস ও অনুশীলন (Websters Encyclopedic Unbridged dictionary, new revised edition 1996, svp.1212). দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন- 'know thyself'. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মানুষের সেবা ও কল্যানের চেতনাকে ধারণ, লালন, পালন ও কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের মধ্যে ধর্মের মহিমা কীর্তিত্ব হয়।

তাই মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ এবং ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক তথা আদিবাসীগণ সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এঁরাই মূলতঃ মানুষ। পরিবেশগত কারণে বিভিন্ন ধর্মের আদর্শে অনুসারী হিসেবে আবার অন্যভাবে নাট্য সম্প্রদায় যারা নাটক করেন এভাবে পেশার দিক থেকেই সম্প্রদায় শব্দটি ব্যবহার করা চলে। কিন্তু আমরা যখন সাম্প্রদায়িকতা বলি, তখন একটি বিশেষ অর্থ দিয়ে বলি। তখন আমার ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়গুলোর কথা মনে রেখে, বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ভেতর, দন্ধ, বিদ্বেষ, পোষনের মানসিকতা ও তৎপরতাই সাম্প্রদায়িকতা বলি। পৃথিবীতে যেমন বিভিন্ন জাতি আছে, ভাষা আছে, সংস্কৃতি আছে, তেমনি সবার উপরে যেটি সত্য তা হচ্ছে- আমরা যে জাতি, সংস্কৃতি, ভাষা সকলেই আমরা মানুষ, সকলেই আমরা বিশ্ব মানব পরিবারের সদস্য। এর ভেতরে সমস্ত বিভিন্নতার উর্ধ্বে আছে একটি সাধারণ সূত্র- তা হচ্ছে মানবিক যা মানুষের ভেতরে মানবিক মূল্যবোধ আছে সেইটিই আমাদের কাছে সবার ওপরে । অপরের দুঃখে দুঃখিত হই, দুঃখ নিবারণে আন্তরিক হয়। এমনকি একে অপরের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই, পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি- সবাই মিলে সভ্যতা-সংস্কৃতির লালন করি, বিজ্ঞানকে জাগিয়ে তুলি, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বল উত্তরাধিকার রেখে যাই। তাই মানুষকে জাগতে হবে, অসাম্প্রদায়িক করে গড়ে তুলতে হবে নিজেকে। মানুষ সচেতন হলে সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রকারীরা কোনোভাবেই সফল হতে পারবে না। সাম্প্রদায়িকভাবে বিষবাষ্প ছড়ানোর পেছনে যারা স্বকৌশলে মদদ দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বারবার ভূলণ্ঠিত করে চলেছে প্রকৃত দোষী, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত তাদেরকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হোক। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কমুক্ত হোক। বিশ্বায়নের যুগে এটা খুবই প্রয়োজন।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে যা কিছু উন্নয়ন ঘটেছে তা অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এমন উন্নয়ন ধর্মান্ধ রাষ্ট্রসমূহে আরো বেশি হয়েছে। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছরে মেধা ও নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটেনি। রাষ্ট্রধর্ম চর্চা করে বুদ্ধির মুক্তি ঘটেনা কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক শক্তির বিকাশ ঘটে। তখন একসময় কাঠামোগত উন্নয়নও বাঁধাগ্রস্থ হবে সন্দেহ নেই। তাই আসুন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে এবং তাঁরই সুযোগ্য তনয়া দেশরত্ন মাননীয় প্রধানন্ত্রীর নেতৃত্বে পিতার নীতি-আদর্শের বাস্তবায়নে আমরা যদি আন্তরিক হই তাহলে জাতির জনকের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আর কোনো রকমের বাঁধা থাকবে বলে মনে হয়না। কিন্তু পদ ও পদমর্যাদাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন আদৌ বাস্তবায়ন হবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ হয়। বাংলা ও বাঙালি জাতির সর্বধর্ম সমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে বৈকি? আজ থেকে আড়াই হাজার বছরের অধিককাল আগে শাক্যরাজ রাজা শুদ্ধোধনের একমাত্র পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম সংসারের মায়া-মোহ ত্যাগ করে সংসার বৈরাগি হয়ে ছয় বছর কঠোর সাধনার মাধ্যমে এক শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ভারতের গয়ায় এক বোধিতরু মূলে গভীর ধ্যানাসনে বসে বুদ্ধজ্ঞান লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তখন থেকে তিঁনি সারাবিশ্বের মাঝে 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হয়ে ভারতের বর্ণ-বৈষম্যে ও জাতপাতের মূলে কুঠারাঘাত করে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে জাত-পাতের কোনো বালাই ছিল না। তাঁর কাছে সব মানুষই সমান এমন কি নারী-পুরুষের সমান অধিকার অর্জনে তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন- "হিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায় না অর্থাৎ শত্রুকে শত্রু দ্বারা জয় করা যায় না। মিত্রতার (মৈত্রী) দ্বারাই শত্রুতাকে বা হিংসাকে জয় করা যায়"। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তাঁর আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বধর্ম সমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ছিল

অসাধারণ ও অতুলনীয়। তাই অতি গৌরব করে বলতে হয়- "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ"। আমরা স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক হিসেবে জাতির জনকের মুক্ত চিন্তা-চেতনাকে দেশ ও জাতির সম্মান অক্ষুন্ন রাখা এবং তাঁর হাতে গড়ে তোলা স্বাধীন বাংলাদেশের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাসকে সমুন্নত করার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক কার্যক্রমকে ফুঁটিয়ে তোলার মাঝেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি যথার্থ সম্মান, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা জানানো আমাদের উচিত।

তাই আসুন, সকলে এক হয়ে সকলের পাশে দাঁড়াই, সকল ধর্মের প্রতি আন্তরিক, সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাশীল হই। এক ধর্মের অনুসারীদের যেকোনো বিপদের সময়ে অন্য ধর্মের লোকজন যেন সহযোগী, সুবুদ্ধিদাতা ও আন্তরিক হই। এ জাতীয় মানবিক, উন্নত মানসিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা চেতনা জাগ্রত থাকলে দেখবেন পৃথিবীটা যেমন সুন্দর তেমনি অতি সুন্দর লাগবে সকল ধর্ম। সুন্দর হয়ে উঠবে প্রতিটি মানুষ এবং মানুষের উন্নত মানষিকতা। তাই ধর্মের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা থাকা একান্ত জরুরী বলে আমি মনে করি। বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের রাজনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যে সফল করার ক্ষেত্রে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ও সম্প্রীতি রক্ষার মানসে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে। পরিশেষে, কবির ভাষায় বলতে হয়-

"অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে,
নির্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে"।

জয়তু বঙ্গবন্ধু। জয়তু স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি। বঙ্গবন্ধুর সর্বধর্মীয় সমন্বয় ও সম্প্রীতি অটুট থাকুক। জয়তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

(লেখক পরিচিতি: সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রফেসর (পালি বিভাগ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সংলাপ ও শান্তি কর্মী, জন হিতৈষী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।)

The women who are not in the military but fight for their motherland are GREAT.

মুক্তিযুদ্ধের গান

উইলিয়াম অতুল

জয় বাংলা জয় বাংলা বলে
চলো এগিয়ে গিয়ে করি শত্রু হনন–
মুক্তিযুদ্ধে মোদের এই ছিল পণ ॥

কত গুলি চাইনীজ রাইফেল থ্রি নটে
কত যে ঘটনা গেছে নিরবে ঘটে
তা হয় নাই গণা-আঁকা চিত্রপটে–
স্মরণে ব্যাথায় কাঁদে অন্তর মন ॥

ধর্ম-বর্ণ ভুলে গোত্রের ভেদ
ঝরেছিল সকলের ঘর্ম ও স্বেদ
তবু যেন লড়াইয়ে মিটেনিকো ক্ষেদ–
সবে কেড়ে এনেছিল স্বাধীনতা ধন ॥

যায় গোলাপের পাপড়ি ঝরে একে একে
পাইনি আজো তাদের নাম-তালিকা–
সেদিন লড়েছিল যারা গায়ে রক্ত মেখে ॥

কেউবা ছিল তাঁদের কৃষক শ্রমিক
কেউবা ছাত্র যুবক চাষা নির্ভীক
কত হত দরিদ্র মজুর সম্বলহীন–
যাঁরা উঠে এসেছিল এই কাঁদামাটি থেকে ॥

নয় মাস লড়ে এনেছিল স্বাধীনতা
গর্ব গৌরবে দিয়ে শুভ বারতা
শেয়ালের মতো তারা যায়নি হেরে–
গেছে পৃথিবীতে স্বদেশের মানচিত্র এঁকে ॥

(লেখক: কবি, গীতিকার, মুক্তিযোদ্ধা, সচীব (অবসরপ্রাপ্ত), দেশ, সমাজ ও চার্চ-এর রূপকল্পদর্শী।)

একাত্তরের কথা

অতুল আই. গমেজ

বঙ্গ বন্ধুর শত বার্ষিকীর সাড়া পড়লো বঙ্গে,
তাইতো আজি নানা সরগরমে উলাস অতি তুঙ্গে।
যার দ্বারা আজ দেশটা পেলাম লাল সবুজের পতাকায়,
পথো চেয়ে আজও আছি শান্তি সুখের আশায়।

পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে স্বাধীন হলাম আমরা,
বাঁচতে দিচ্ছোনা স্বাধীন ভাবে নরঘাতক তোমরা।
আলবদর আর রাজাকারেরা আজও বাংলার বুকে,
আম জনতার মাথায় বসে আজও খাচ্ছো সুখে।

একাত্তরে ওদের দাপট ছিলো বাংলা জুড়ে,
আজও ওরা হয়নি নির্মূল, খাচ্ছে ঘুরে ফিরে।
পঁচিশের ঐ কালো রাতে রাজধানীর ঐ বুকে,
ঘুমের ঘোরে নিরস্ত্র বাঙ্গালী পড়লো মহা বিপাকে।

হানাদার আর নরপিশাচ আলবদর আর রাজাকার,
এক মূহুর্তে করে দিলো রাজধানীটা ছারখার।
গুলির পর গুলি চালালো রক্তে ভাসলো ঢাকা,
রাতারাতি ছুটলো মানুষ ঢাকা হলো ফাঁকা।

শহর ছেড়ে ছুটলো গ্রামে হানাদারের দল,
হত্যা যজ্ঞ জ্বালাও পোড়াও চালালো অবিচল।
বাদ পড়েনি আমার গ্রামটি পাশা পাশি আরো,
নিধন যজ্ঞ বাড়ি বাড়ি বাদ পড়েনি কারো।

গ্রামের পর গ্রাম জ্বালালো ছুটলো মানুষ ভয়ে,
প্রাণের ভয়ে সবাই ছুটলাম থাকলাম না আর গাঁয়ে।
মুক্তি সেনা ঢুকলো দেশে শুরু হলো যুদ্ধ,
ধীরে ধীরে হানাদারদের দল বাংলায় হলো রুদ্ধ।

মাসের পর মাস কাটালাম থাকলাম অন্যের দ্বারে,
অনাহার আর অর্ধাহারে দিন কেটেছে লড়ে।
চারিদিকে চরম হাহাকার বাতাসে কান্নার রোল,
বীর বাঙ্গালীর কষ্টেও মুখে জয় বাংলার বোল।

মা বোনেরা সম্ভ্রম দিলো শহীদ তিরিশ লক্ষ,
মুক্তি যুদ্ধে শূন্য হলো লক্ষ মায়ের বক্ষ।
বহু কষ্ট ত্যাগ তিতিক্ষায় নয়টি মাসের শেষে,
লাল সবুজের ঝান্ডা উড়লো বাংলার আকাশে।।

জাতির পিতার মৃত্যু নেই

প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী

পাকিস্তান আমলে স্বৈরাচার ও সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় ধনীদের দ্বারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ওপর শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববাংলা বর্তমান বাংলাদেশ– স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী যার নামকরণ করেছিল পূর্ব পাকিস্তান– সেই অপচেষ্টা ও অপরাজনীতির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার পূর্বেই তিনি জাতির পিতা ও বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালের ২৫ অক্টোবর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগ-আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি পূর্বপাকিস্তানের নামকরণ করেন ‘বাংলাদেশ’। তিনি বলেন, ‘আমাদের আবাসভূমির নাম পূর্বপাকিস্তান নয়, হবে ‘বাংলাদেশ’।

তবে একদিনে তো নয়, অন্যায়, অবিচার, অর্থনৈতিক শোষণ-নিপীড়ন, রাজনৈতিক অধিকারহীনতা, সাংস্কৃতিক অবরুদ্ধতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে সংগ্রাম করতে করতে বঙ্গবন্ধু পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে স্বাধীনতার স্বর্ণদ্বারের সম্মুখে এনে দাঁড় করান।

বঙ্গবন্ধু কৈশোরেই সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দেন। ১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল পরিদর্শনে যান অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক ও শিক্ষামন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এ দুই নেতার কাছে তিনি ছাত্রাবাসের ছাদ মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দের দাবি জানান। এভাবেই ন্যায্য অধিকার আদায়ের পথে শুরু হয় তাঁর অভিযাত্রা।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের কূটকৌশলে– ‘বিভেদ কর এবং শাসন কর’– এই অপরাজনীতি বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র হিসেবে শুরু হয় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও দাঙ্গা। তখন বঙ্গবন্ধু কলকাতায় মহাত্মা গান্ধী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে অনশনে অংশগ্রহণ করেন। তখন তিনি বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রসংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক।

অতঃপর নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে জিন্নাহ্ সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্ব যেন বাস্তবে রূপ পায়– হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি– এ হলো দ্বিজাতিতত্ত্ব। ভারত এমনভাবে বিভক্ত হয়, যা ছিল অকল্পনীয়। মুসলিম অধ্যুষিত ভারতের পশ্চিম অংশ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পূর্ববাংলা নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান নামক পৃথক রাষ্ট্র। একটি দেশের দুটি অংশের মধ্যে ১২০০ মাইলের ব্যবধান। বাকিটা ভারত। পাকিস্তানে পূর্ববাংলা হয়ে যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যে-কোনো সিদ্ধান্ত পূর্ববাংলার অনুকূলে চলে যেতে পারে। চিন্তিত হয়ে পড়ে পাকিস্তানের শোষকগোষ্ঠীর সমর্থক নেতৃবৃন্দ। তখন তারা কূটকৌশলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে এক ইউনিট ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পাকিস্তানের পশ্চিম প্রান্তের সবগুলো প্রদেশ নিয়ে এক ইউনিট পশ্চিম পাকিস্তান গঠন করা হয়। পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান। বাংলা ও বাঙালিত্বের আদর্শকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়। সামনে নিয়ে আসা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মীয় চেতনাকে।

বঙ্গবন্ধু সেখানে সামনে নিয়ে আসেন ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র চেতনা। তবে মনে রাখতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা বর্তমান সরকারের নীতি। তিনি আরও বলেন যে,